যে কারণে ইতিহাসে অমর তিনি

মুহাম্মদ শামসুল হক

চার অক্ষরের একটি শব্দ 'স্বাধীনতা'। পরিধি তার ব্যাপক। নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসরত ব্যাপক জনগোষ্ঠীর ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ঐতিহ্য, অর্থনীতি, রাজনীতিসহ জীবনের সামগ্রিক ক্ষেত্রে নিজস্ব রীতিনীতি, স্বকীয়তা অটুট রেখে স্বজাতির ম্যাণ্ডেট নিয়ে জনপ্রতিনিধির শাসনে পরিচালিত হতে পারার গ্যারান্টিই হচ্ছে স্বাধীনতা। যে কোনো দেশের স্বাধীনতা এমন একটি অমূল্য সম্পদ, যা কুড়িয়ে পাওয়া যায় না কিংবা ইচ্ছে করলে অথবা 'স্বাধীন হয়ে যাও' বললেই হয়ে যাওয়ার বিষয় নয়। অধ্যাপক মমতাজ উদ্দীন আহমদের ভাষায় 'স্বাধীনতা মামার বাড়ির আবদার নয়। স্বাধীনতা যুদ্ধ কোন অর্বাচিন যুবকের হঠকারিতা নয়।' সাধারণভাবে রাষ্ট্র একটি স্থায়ী ধারণা, সার্বভৌমত্বের প্রতীক ও প্রতিজ্ঞার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী রাষ্ট্র ছাড়া স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণও আত্মতৃপ্তি নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে না।

যেমন ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে মুক্তির জন্য বহু বছর ধরে নানা আন্দোলনের এক পর্যায়ে আলোচনার ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি পৃথক রাষ্ট্র জন্ম নিয়েছে ১৯৪৭ সালে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ভারত ও পাকিস্তানের মতো এশিয়া এবং আফ্রিকায় অনেক ঔপনিবেশিক দেশ (কলোনি) সমঝোতার মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করেছিল। ৮০-৯০ এর দশকে পরাক্রমশালী সোভিয়েত রাশিয়া থেকে সমঝোতার ভিত্তিতে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে উজবেকিস্তান, কাজাকিস্তান, লাটভিয়াসহ সাতটি সোভিয়েত অঙ্গরাজ্য।

তবে অনেক ক্ষেত্রে হাজারও বৈপরীত্য সত্ত্বেও শাসকগোষ্ঠী স্বাধীনতাকামী জনগোষ্ঠীর অধিকার ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে নানা কলা-কৌশলে অস্বীকার কিংবা অস্ত্রের মাধ্যমে ঠেকিয়ে রাখতে চায়। এক্ষেত্রে লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীকে একই মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে, একই কাতারে সামিল হয়ে, বিনা প্রশ্নে নিঃস্বার্থভাবে জানমাল সমর্পণ করার প্রস্তুতি নিতে হয়। আর এরকম প্রস্তুতির জন্য জনগণকে মানসিক ও সাংগঠনিকভাবে উপযুক্ত করতে প্রয়োজন কৌশলী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন যোগ্য নেতার। কারণ, স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রক্রিয়া যেমন দীর্ঘ, যুদ্ধের ফলাফলও তেমন অনিশ্চিত। উদাহরণ আমাদের চোখের সামনে। আরব ভূখণ্ডে ফিলিস্তিনি-জাতি প্রায় পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে ইসরাইলের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই চালিয়ে যাবার পরও স্বাধীনতা পায়নি। ইয়ান স্মিথ রোডেশিয়ার শেতাঙ্গ সংখ্যালঘু সরকারের পক্ষ থেকে ১৯৬৫ সালের ১১ নভেম্বর রোডেশিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই সংখ্যালঘু সরকার কৃষ্ণাঙ্গ সংখ্যাগরিষ্ঠদের শাসনের বিরোধী থাকার কারণে ব্রিটিশ সরকার, কমনওয়েলথ এবং জাতিসংঘ এই স্বাধীনতা ঘোষণাকে অবৈধ ঘোষণা করে। পরবর্তী সময়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের সরকার প্রতিষ্ঠার পর ১৯৮০ সালে রোডেশিয়া জিম্বাবুয়ে নামে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

১৯১৬ সালে ইস্টার অভ্যুত্থানের সময় ডাবলিনে কিছু আইরিশ বিদ্রোহী জনগণের পক্ষ থেকে সমগ্র আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। কিন্তু কোনো নির্বাচিত প্রতিনিধি সম্পৃক্ত না থাকায় সেই ঘোষণাটি ৬ বছর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়নি। পরবর্তী সময়ে আইরিশ ফ্রি স্টেট ১৯২২ সালে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। আয়ারল্যান্ডের উত্তরাংশ এই রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত ছিল না।

আজকের স্বাধীন সার্বভৌম সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশের জন্ম ১৯৭১ সালে। জাতি হিসেবে বাঙালি ও নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশি বিশ্বে আমাদের পরিচয়। কিন্তু এখন থেকে অর্ধশত বছর আগেও জাতি হিসেবে আমাদের কোনো পরিচয় ছিল না। একাত্তরের আগে ২৪ বছর ধরে আমরা ছিলাম পাকিস্তান নামক একটি দেশের পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশের বাসিন্দা। শাসন-শোষণ, বৈষম্য ও অধিকারহীনতায় আমাদের অবস্থান ছিল মূলত উপনিবেশের শৃঙ্খলে বন্দি মানুষের মতো। তারও আগে প্রায় দুশো বছর ব্রিটিশ শাসনসহ যুগে যুগে নানান জাতিগোষ্ঠীর শাসন-শোষণের যাঁতাকলে বাঙালিরা পিষ্ঠ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ২৩ বছর নিয়মতান্ত্রিক ও সাড়ে নয় মাস সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে একাত্তর সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। আর এ লড়াইয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে এক কাতারে সামিল করে এগিয়ে নেওয়ার কঠিন কাজটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, 'বাংলাদেশ' নামক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

ধর্মীয় জাতিসত্তাবিশিষ্ট পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের আওতায় শাসিত হবার প্রাথমিক অবস্থা থেকে বাঙালি জাতির অন্ধকার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কেউ কেউ আঁচ করতে পেরেছিলেন। যতই দিন যায় ততই তাঁদের উপলব্ধি তীব্র হতে থাকে। রাজনীতিক, ছাত্রসমাজ, সশস্ত্র বাহিনী ও অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে শ্রেণি-পেশার লোকজনের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা দানা বাঁধতে থাকে। সব শ্রেণির মানুষের স্বপ্নকে নিজের স্বপ্ন ও চেতনার সাথে মিশিয়ে বঙ্গবন্ধু এমনভাবে স্বাধীনতার সোপান তৈরি করেন যা সমসাময়িক অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ নেতার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

শেখ মুজিব ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিমের মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন গণতান্ত্রিক নেতা ও মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর মতো মাঠচষা নেতাদের ভাবশিষ্য। বলা যায়, তাঁদের হাত ধরেই শেখ মুজিবের নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে। কিন্তু তারুণ্য-যৌবনের জয়যাত্রায় তাঁর চিন্তা-চেতনা ছিল ওই দুই নেতার তুলনায় অগ্রসর, আধুনিক এবং স্পষ্ট, বিশেষ করে বাংলার স্বাধিকার-স্বাধীনতার প্রশ্নে। চীনের সাথে সম্পর্কের কারণে পাকিস্তানের অখণ্ডতার ব্যাপারে ভাসানী ছিলেন দোদুল্যমান, আর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সোহরাওয়ার্দী ছিলেন পাকিস্তানের অখণ্ডতার পক্ষে। জানা যায়, ৬১ সালে লন্ডনের এক হোটেলে শেখ মুজিব সোহরাওয়ার্দীকে 'পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন হতে হবে' বললে সোহরাওয়ার্দী রেগে গিয়েছিলেন। আগে থেকে পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এবং মুসলিম লীগের ছায়াতলে থেকে রাজনীতি করা এবং পরে আওয়ামী লীগে সামিল হওয়া অনেক

নেতা-কর্মীও পাকিস্তানকে ভাঙার মতো চিন্তা-ভাবনা মেনে নিতে পারেননি। বিষয়টির প্রতি খেয়াল রেখেই মুজিব প্রবীণ নেতাদের ছায়ার নীচে থেকে নিজের গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করেন সবার মাঝে।

১৯৫৬ সালে গণপরিষদে পূর্ব বাংলার নাম পরিবর্তন করে পূর্ব পাকিস্তান করার প্রস্তাব করে পাকিস্তান সরকার। এর আগে এই প্রদেশের নাম ছিল পূর্ব বাংলা। বঙ্গবন্ধু সে সময় গণপরিষদে দেওয়া বক্তৃতায় 'পূর্ব বাংলা' নাম পাল্টানোর বিরোধীতা করে এর নাম শুধু 'বেঙ্গল' (বাংলা) করার প্রস্তাব করেন। ওই অধিবেশনেই তিনি বাঙালিদের ওপর জুলুম-শোষণ বন্ধ না হলে জনগণ সংবিধান বিরোধী অনিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করতে বাধ্য হবে বলে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীকে হুঁশিয়ার করে দেন। ষাটের দশকের শুরুতে (১৯৬১ সালে) আওয়ামী লীগ ও কম্যুনিস্ট পার্টির এক গোপন সভায় শেখ মুজিব খোলাখুলিভাবে স্বাধীনতার দাবিকে আন্দোলনের কর্মসূচিতে রাখার আহ্বান জানিয়েছিলেন কমরেড মনি সিংহের প্রতি। সেদিন তিনি বলেছিলেন, 'একটা কথা আমি খোলাখুলি বলতে চাই, আমাদের বিশ্বাস, গণতন্ত্র, স্বায়ত্বশাসন এসব কোনো দাবিই পাঞ্জাবিরা মানবে না। কাজেই স্বাধীনতা ছাড়া বাঙালিদের মুক্তি নেই।'১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধু বাঙালির মুক্তিসনদ হিসেবে ছয় দফা ঘোষণা করলে পাকিস্তান সরকার একে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশকে বিচ্ছিন্ন করার চক্রান্ত হিসেবে প্রচার চালায়। দেশব্যাপী বঙ্গবন্ধুর ব্যাপক সফর ও ছয় দফার প্রচার-আন্দোলনে জনসমর্থন দেখে তা দমানোর জন্য সরকার বঙ্গবন্ধুসহ দলের নেতা-কর্মীদের ওপর ব্যাপকহারে গ্রেপ্তার ও দলন, নিপীড়ন চালাতে থকে।

ছয় দফার মধ্যে প্রকৃতই স্বাধীনতার বীজ অঙ্কুরিত ছিল। সেটা বুঝতে পেরেই কথিত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলার মধ্যদিয়ে বঙ্গবন্ধুকে চিরতরে শেষ করে দিতে চেয়েছিল আইউব খান সরকার। কিন্তু এরই মধ্যে শেখ মুজিবের ওপর জনগণের আস্থা আরও বেড়ে যায়। ছয় দফা ও ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের ১১ দফার ভিত্তিতে সৃষ্ট তীব্র গণ-আন্দোলনের ফলে ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি সামরিক সরকার সেই মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় এবং বঙ্গবন্ধুসহ অভিযুক্তরা মুক্তি পান। ২৩ ফেরুয়ারি পল্টনে ছাত্র-গণ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত হন। জনগণের কাছে এই মামলা মিথ্যা প্রতীয়মান হওয়ার প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু বাঙালির অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত হন। একই সঙ্গে তৈরি হয় স্বাধীনতার জন্য প্রকাশ্যে দাবি তোলার পটভূমি। ১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর ঢাকায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এক সভায় বঙ্গবন্ধু পূর্ব বাংলার নামকরণ করেন 'বাংলাদেশ'।

১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে পাকিস্তান জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ছয় দফার ভিত্তিতে এই নির্বাচনে অংশ নিয়ে বঙ্গবন্ধুর দল আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজয়ী হলেও পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার জন্য নানা চক্রান্ত শুরু করে। পাকিস্তানি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান মার্চের এক তারিখ অনুষ্ঠেয় জাতীয় পরিষদ অধিবেশন বাতিল করলে ছাত্র-জনতার বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং স্বাধীনতার দাবি জোড়ালো হয়। ৭ মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে স্মরণকালের বৃহত্তম সমাবেশে তাঁর কালজয়ী ভাষণে সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ভাষণে তিনি 'এবারের সংগ্রাম-মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম -স্বাধীনতার সংগ্রাম' উল্লেখ করে শত্রুর বিরুদ্ধে যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত হওয়ার জন্য ছাত্র-জনতার প্রতি আহ্বান জানান। ২৫ মার্চ পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় সমস্ত প্রশাসন চলে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে। ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পুলিশ, বিডিআরসহ নিরস্ত্র জনতার ওপর গণহত্যা, বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ ও নির্যাতন শুরু করলে বঙ্গবন্ধু ওয়্যারলেসহ একাধিক ব্যবস্থায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এরপর রাত প্রায় দেড়টার দিকে সেনাবাহিনী তাঁর বাসভবন আক্রমণ করে তাঁকে গ্রেপ্তার করে প্রথমে ঢাকা সেনানিবাসে এবং পরদিন পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁরই পূর্বনির্দেশনা অনুযায়ী তাঁর সহযোগী নেতাদের পরিচালনায় ছাত্র-জনতা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাঁকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করে প্রবাসী সরকার। তাঁর প্রতিকৃতি ও নির্দেশনাকে স্মরণ করেই নয় মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধে শত্রুকে পরাজিত করার মাধ্যমে বিজয় ছিনিয়ে আনে বাঙালিরা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর প্রায় ৫৫ বছর জীবনকালে প্রায় ১৩ বছরই কারাগারে কাটিয়েছেন। এর মধ্যে সবচাইতে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও শ্বাসরুদ্ধকর ২৮৯ দিনের বন্দি জীবন কেটেছে তাঁর- মুক্তিযুদ্ধকালে, পাকিস্তানের কারাগারে। রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে সামরিক আইনে এক প্রহসনের বিচারে তাঁকে ফাঁসির দণ্ড দেওয়া হয়েছিল। বাঙালি জাতির দৃঢ় প্রত্যয়, আন্তর্জাতিক মহলের চাপ ও নিজেদের স্বার্থ বিবেচনায় শেষ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় পাকিস্তান সরকার। অবশেষে সাড়ে ৭ কোটি মানুষের শ্বাসরুদ্ধকর প্রতীক্ষার প্রহর পেরিয়ে ১০ জানুয়ারি লন্ডন থেকে দিল্লী হয়ে তিনি তাঁর স্বপ্নের স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন জাতির পিতা হয়ে।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, স্বাধীনতার প্রয়োজনের কথা অনেকেই আকারে ইঙ্গিতে, ঘরোয়া আলোচনায় বিভিন্ন সময় বললেও কেউ এই লক্ষ্যে জনগণকে একত্রিত বা সংগঠিত করে সুনির্দিষ্ট কোনো কার্যক্রম হাতে নিতে পারেননি। জেল জুলুম সহ্য করে, মৃত্যুঝুঁকি মাথায় নিয়ে সময়োপযোগী ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ধাপে ধাপে এক একটি বাধা অতিক্রম করে বঙ্গবন্ধু স্বাধিকার আন্দোলনকে স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপ দিয়েছেন যা আর কারও সাহসে কুলোয়নি। তাঁর নেতৃত্বে এই সংগ্রামের ফলেই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়। বিশ্ব দরবারে বাঙালি পরিচিতি পায় আলাদা জাতি হিসেবে। এজনই স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ ও বিশ্ব দরবারে বাঙালিদের আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার জন্য ইতিহাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

#

লেখক- জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক, বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গবেষণাকর্মী, সম্পাদক-ইতিহাসের খসড়া।

২৭.০৩.২০২২ পিআইডি ফিচার